উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ২৭ ভাদ্র ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ১১৭ সংখ্যা

রাজনীতিকদের সম্পত্তি

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা কিংবা লোকসভা— যেকোনো পর্যায়ের ভোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ছাড়পত্র, চলতি বাংলায় টিকিট পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন কিছু রাজনীতিক। তাঁদের সংখ্যাটা অবশ্য খারাপ নয়। মানুষের জন্য রাজনীতিতে যতটা না আগ্রহ দেখা যায়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আগ্রহ দেখা যায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর ছাড়পত্র পেতে। ছাড়পত্র নিয়ে কোন্দলে কোনো কোনো দলের নিজেদের মধ্যে মারামারি তো বটেই, দল বিভাজনের নজিরও আছে। নির্বাচনের টিকিটের টোপ দিয়ে দল ভাঙানোর, দলবদলের খেলাও এখন আর নতুন কিছু নয়। অথচ সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের স্বার্থে রাজনীতি করায় ভোটে লড়াইটা তো কোনো শর্ত হতে পারে না। জনপ্রতিনিধি হওয়াটা একটা ধাপ বা পর্যায় হতে পারে, যার ফলে কোনো একটা জায়গায় মানুষের কথা বলা সম্ভব। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এত তীব্র ইচ্ছে কেন রাজনীতিকদের মধ্যে, কেন মন্ত্রী হওয়ার তীব্র বাসনা তাঁদের অহর্নিশি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবে দেখা গিয়েছে, মন্ত্রিত্বের চেয়েও জনপ্রতিনিধি হওয়ার উদগ্র বাসনাটাই বেশি এহেন রাজনীতিকদের মধ্যে। নিশ্চিতভাবেই এর পিছনে কারণ রয়েছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একটা অংশের সম্পত্তি আগের তুলনায় পরে যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে বিচারবিভাগও। একইসঙ্গে এই প্রসঙ্গে নির্লিপ্তির জন্য কেন্দ্রের সমালোচনাও করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কর্ম এবং রাজনীতি যে এখন ভালো ব্যবসা তা আর নতুন কিছু নয়। এমন বহু নজির রয়েছে যেখানে একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ এই ক্ষেত্রে জড়িয়ে পরবর্তীকালে কার্যত টাকার গদির উপর শুয়ে থেকেছে। যাঁরা চোখের সামনে দেখেছেন, বাস্তব এই উদাহরণগুলিকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না। জনপ্রতিনিধিদের সম্পত্তির পরিমাণ এত বাড়ছে কীভাবে, তা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলা সংক্রান্ত একটি তথ্য জমা পড়েছে আদালতে। তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রায় সব রাজ্যেই সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে জনপ্রতিনিধিদের। সম্পত্তি বেড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও। সুপ্রিমকোর্টে কেন্দ্রের তরফে দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সাতজন সাংসদ এবং ৯৮ জন বিধায়কের সম্পত্তি বিপুল পরিমাণ বেড়েছে। এইসব সাংসদ, বিধায়কের নাম কেন্দ্রের তরফে সর্বোচ্চ আদালতে জানানো হবে লিখিতভাবেই। তবে ইতিমধ্যেই এইসব রাজনীতিকের বিরুদ্ধে আয়কর দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। যে সংগঠনের তরফে সুপ্রিমকোর্টে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের দাবি, লোকসভার ২৬ জন, রাজ্যসভার ১১ জন এবং ২৯৭ জন বিধায়কের সম্পত্তি বহুগুণে বেড়েছে। তারা এই অভিযোগ আদালতেও জানিয়েছে। মামলার শুনানি শেষে আদালত হয়তো কোনো রায় দেবে, তার ভিত্তিতে তদন্ত আরও অন্য পর্যায়ের হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাতে কি এই ধরনের রাজনীতিকদের বোধোদয়ের কোনো সম্ভাবনা আছে। এর উত্তর বাস্তবিকই কারও জানা নেই। আয়বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই জয়ললিতার কারাবাস হয়েছিল। কিন্তু সেই নজির যে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের মধ্যে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি তার প্রমাণ প্রচুর রয়েছে। রাজনীতিকদের একটা বড়ো অংশের যে আয়বহির্ভূত সম্পত্তি রয়েছে তা কেন্দ্রের অজানা নিশ্চয়ই নেই। কারণ তাঁদের একটা তালিকা তো তারাই দিয়েছে আদালতকে। কিন্তু সব জানার পরেও কেন যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়নি এই কৈফিয়ত দেশের সাধারণ মানুষ চাইতেই পারে। চোখের সামনে অসৎ রাজনীতিকদের বাড়ি বড়ো হয়, গাড়ির সংখ্যা বাড়ে, বাড়ে বিলাস। অথচ সাধারণ মানুষ যে তিমিরে থাকে সেখানেই থেকে যায়। তার অবস্থার পরিবর্তন হয় না। রাজনীতি নামক ব্যবসার এই বাড়বাড়ন্ত স্বাভাবিকভাবেই এক শ্রেণির অসৎ, স্বার্থপর মানুষকে কালো পথে আয়ের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে হিসাববহির্ভূত আয়ের বিষয়ে তথ্য রয়েছে। কিন্তু নেতৃত্ব কোনো এক 'অজানা' কারণে এই বিষয়টির সঙ্গে আপস করেই চলে। এটাই দুর্ভাগ্যজনক। আর এই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় ভারতবাসীর আছে কিনা সন্দেহ।

অমৃতধারা

কেউ কেউ বলে তারা সত্যের অনুসন্ধান করছে। একথা অর্থহীন, কারণ তুমি নিজেই হলে সত্যের মূর্ত বিগ্রহ, আর সত্য ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই তত্ত্ব সম্পর্কে তুমি অবহিত নও বলে নানা ভুল পথে তুমি চলতে থাক। সহশিক্ষার বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকারা একসঙ্গে পড়াশোনা করে থাকে। ওই আবেগপ্রবণ বয়সে বালক-বালিকাদের কোনও আত্ম-সংযম থাকে না। বালক এবং বালিকারা প্রথমে পরস্পর দৃষ্টিপাত করে, দৃষ্টি বিনিময় করে, তারপর মৃদুহাসি, কথা বলা, পত্র বিনিময় ইত্যাদির দ্বারা বন্ধুত্ব তৈরি হয় এবং পরিশেষে পারস্পরিক সান্নিধ্যে আসে। গোড়াতেই তোমাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। শুধুমাত্র ভগবানকে দেখবার জন্যেই, সঠিক দৃষ্টিদানের জন্যে চোখের ব্যবহার, শুধু ঈশ্বরের নাম কীর্তন শোনবার জন্যে কর্ণ ব্যবহার এবং শুধু পুজো করবার জন্যে হাতকে ব্যবহার করবার জন্য বহু সাধু-সন্ন্যাসী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। জয়দেব তাঁর এক সংগীতে অসত্য কথা না বলবার জন্যে, অপরের নিন্দা না করবার জন্যে এবং অতিরিক্ত কথা এড়িয়ে চলবার জন্যে জিহ্বাকে অনুরোধ করছে।

অন্য সবাইকে 'তুমি কে ?' এই প্রশ্ন না করে তোমাদের উচিত প্রশ্ন করা, আমি কে ? নিজের প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। তোমাদের প্রকৃত সত্তা অহংকার এবং আসক্তির বাহ্যিক আবরণ দ্বারা ঢাকা পড়ে আছে। নিজের উন্মুক্ত বক্ষকে দেখতে হলে ওই সকল পোশাক খুলে ফেলতে হবে। এই সকল মালিন্য ও আবরণ হল সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো, এই ত্রিগুণের প্রতীক। নিজের অন্তর আত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে তোমায় এই ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

–শ্রী শ্রী সত্যসাই

শব্দরঙ্গ ■ ১৭৯৪

পাশাপাশি ঃ ২। শাঁখের মধ্যে সেরা ৫। দেশি মুরগির আকৃতির পাখি বিশেষ ৬। সত্য মিথ্যা যাচাই না করে যে অন্যের লাগানো কথা বিশ্বাস করে ৮। সূর্য ৯। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ১১। ক্ষতিকর, বিপজ্জনক, মারাত্মক ১৩। নক্ষত্র বিশেষ, শ্রীরাধিকার অন্যতম সখী ১৪। যিনি ভিন্ন দেশে নিজের দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির তত্ত্বাবধান করেন, বাণিজ্যদূত।

উপর-নীচ ঃ ১। বিশাল শরীর এমন, প্রকাণ্ড, রাবণের একপুত্র ২। কিরণ, রশ্মি বা খাজনা ৩। কথা, উক্তি, পদের একত্ব বা বহুত্ব ৪। দিনমজুর, মুনিশ ৬। কানাই-এর আদরের ডাক ৭। ভারবাহী প্রাণীর পিঠের গদি, গোরুর স্তন ৮। মৃৎশিল্পী, সূর্য ৯। বাংলার প্রাচীন গণনার একটি একক, কালো বা ধুসর রংয়ের পাখি বিশেষ ১০। খণ্ডখণ্ড, টুকরো টুকরো ১১। যে জমির কর দিতে হয় ১২। নির্বোধ, দ্বিপরবুদ্ধিহীন, নাবালক ১৩। জলাভূমি।

সমাধান ■ ১৭৯৩

পাশাপাশি ঃ ১। রসিকতা ৩। ধকল ৫। ওকালতনামা ৬। সলিল ৭। ডগর ৯। জয়জয়কার ১২। কয়লা ১৩। রক্তাম্বর।

উপর-নীচ ঃ ১। রঙ্গরস ২। তাড়কা ৩। ধপাত ৪। লহমা ৫। ওল ৭। ডর ৮। রবিকর ৯। জম্বুক ১০। জটলা ১১।কাহার।

অনাদি অনন্ত সহবাসবিধি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স কম হয়ে যাওয়ায় চতুর্থী কর্মের আচারও উঠে যায়। থেকে যায় শুধুই গর্ভাধান। অন্যেরা চতুর্থী কর্ম শব্দটা বাদ দিয়ে বলেছেন নিষেক কর্ম

গর্ভাধানের জন্য শারীরিক মিলনের যে প্রয়োজনটুকু আছে, হাজারো দৈবতত্ত্বে বিশ্বাসী বৈদিকেরা সেটা কখনই বিস্মৃত হননি বা সেটা দেবতার দয়ার উপরেও ছেড়ে রাখেননি। ঋকবেদের সময় থেকে অথর্ববেদের কালে এসেই গর্ভাধানের ক্ষেত্রে শারীরিক মিলনের তাৎপর্য উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রূপকের মাধ্যমে অথর্ববেদ বলেছে–শমীলতার উপরে আরূঢ় হয়েছে অশ্বত্থ বৃক্ষ। ওই স্থানেই পুত্রলাভের স্পষ্টতা আসে। স্ত্রীগর্ভে আমরা সেই পুত্র বহন করে আনি–তদ্‌ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষু আভরামসি। অথর্ববেদে আরও কিছু মন্ত্র আছে এবং তা এখানে অনুচ্চারিত থাক–কিন্তু সেই মন্ত্র পরম্পরা বিচার করলে দেখা যাবে গর্ভাধানের আনুষ্ঠানিকতা এখান থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতা একেবারে পরিণত স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের আধার বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

এটা সত্যিই ভাবা যায় না। বৃহদারণ্যকের মতো গেরেমভারী উপনিষদ, যার এক একটি বাক্য বেদান্তদর্শনের এক একটি দিক খুলে দেয়, সেই উপনিষদের শেষে কিনা গর্ভাধানের আলোচনা ? প্রাজ্ঞমন্যরা বলে ফেলেন–প্রক্ষেপ। আমরা বলি–শেষেরও শেষ দেখুন। সদ্যোজাত শিশুটিকে জননীর কোলে বসিয়ে দিয়ে পিতা স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, তোমাকে স্তুতি করাই উচিত। তুমি সেই পূর্বকল্পের মৈত্রাবরুণী। তুমি এই বীর পুত্র প্রসব করে আমাদের বীরবান করেছ, তাই তুমিও বীরবতী হও–ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ, সা ত্বং বীরবতী ভব।

বীরবংশ এবং ঋষিবংশের পরম্পরা রক্ষা করার কথা মনে রেখেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলিকে আনুষ্ঠানিকতার আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতাই পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থগুলির মধ্যে আচার এবং প্রথাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

পুত্রলাভের ইচ্ছায় গর্ভাধান যখন সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তখন কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা প্রাচীন গ্রন্থমতে তার বিধান তৈরি হয়নি। তখন তার মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র এসেছে। অন্য জায়গায় অন্য প্রসঙ্গে বলা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান এসেছে, এমনকি দৈনন্দিন নিত্য পূজাপদ্ধতিও তার মধ্যে খানিকটা এসে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও আছে সেই বাস্তব দৃষ্টি, যার উপরে ভিত্তি করে এত আচার, বিচার, সংস্কার। অর্থাৎ স্মার্তরা এটা ভোলেননি যে, ঋতুকাল থেকে ষোলো দিনের মধ্যে গর্ভাধানের অনুষ্ঠানটি করতে হবে। সন্তানটি যাতে পুত্র হয় তার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা পুংনক্ষত্রের যোগ ঘটলে সাধারণ গণেশপুজো, মাতৃকাপূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ইত্যাদি সেরে মূল গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে বসতে হত। এখানে একটি চরুপাকের ব্যাপার আছে এবং তার মন্ত্রতন্ত্র নেওয়া হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে। চরু আহুতি দিয়ে অবশিষ্ট চরু নিজে খেয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে হোমে বসতে হবে। ওই হোমের সময় বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে আগুনে আহুতি পড়বে এবং তখনকার মন্ত্রগুলি কিন্তু সেই ঋকবেদের মন্ত্র, যা আমরা বলেছি–বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু–থেকে সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে বলা মন্ত্র পর্যন্ত।

গর্ভাধানের মন্ত্রগুলির মধ্যে দেবতা হিসেবে কখনও বিষ্ণু, কখনও অশ্বিনীদ্বয়, কখনও অগ্নি কখনও বা সূর্যও আছেন। আরও আছেন অন্য দেবতারাও। কিন্তু দিনের বেলায় ব্রত-পূজা হোমের শেষ পর্বে সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার সময় সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডটাকে 'নবপুষ্পোৎসব' বলে বর্ণনা করার মধ্যে বিশ্ব-পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা যেমন আছে, তেমনই আছে এক জাগ্রত বিশ্বাস, যাতে বোঝা যায় ফলবান বৃক্ষ দেবতার মতো পুষ্পবতী রমণীও সন্তানরূপ ফলের সঙ্গে যুক্ত হবে–বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ। নবপুষ্পোৎসবে হ্যেতৎ গৃহানার্ঘ্যং দিবাকরঃ। হোমের শেষে সূর্যপ্রণাম শেষ হওয়ার পর যজ্ঞের অবশেষ হিসাবে পত্নী যা পাবেন, তা হল একটি ফল। পত্নী হস্তপ্রসারণ করে সেটি গ্রহণ করেন সন্তানলাভের পূর্বপ্রতীক হিসেবে।

আমাকে এই রকম একটি যজ্ঞে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। আগে কিছুই বুঝিনি, কিছু জানতামও না। আমারই এক ভাইয়ের পুত্র-কন্যা হয় না, মনে তার বড়ো দুঃখ। ওষুধ-বিষুধ-ডাক্তারি শেষ হল। শল্য চিকিৎসায় ভ্রাতৃবধূর সন্তান হতে গিয়েও কিছু অঙ্গহানিও ঘটল। শেষে পুরোহিত ডেকে হোম-যজ্ঞ করানো হল–দেখলাম পুরোহিত যা করে গেলেন, তার সবটাই গর্ভাধানের সংস্কার এবং পরিশেষে একটি ফলও ধরিয়ে দিলেন ভ্রাতৃবধূর হাতে। সে ফল খেয়ে বা হস্তে ধারণ করে ভ্রাতৃবধূর এখনও কোনো পুত্র হয়নি। কিন্তু সে অন্য কথা। স্মার্তদের একথা জিজ্ঞাসা করলে তারা যা বলেন, তা অবশ্য ডাক্তারদের কথার সঙ্গেও মিলে যায়। অধিক বয়সে বিবাহ স্মার্তদেরও পছন্দ নয়, ডাক্তারদেরও পছন্দ নয়। স্মার্তরা যেটাকে নৈতিক অন্যায় বলে মনে করেন, ডাক্তাররা সেটাকে শারীরিক সমস্যা-সৃষ্টির কারণ বলে মনে করেন।

অধিক বয়সে বিবাহ স্মার্তদেরও পছন্দ নয়, ডাক্তারদেরও পছন্দ নয়। স্মার্তরা যেটাকে নৈতিক অন্যায় বলে মনে করেন, ডাক্তাররা সেটাকে শারীরিক সমস্যা-সৃষ্টির কারণ বলে মনে করেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মহাভারত-রামায়ণের যুগ পর্যন্তও আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হত না। আবার অতি অধিক বয়সেও হত না।

একথা অনস্বীকার্য যে, বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মহাভারত-রামায়ণের যুগ পর্যন্তও আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হত না। আবার অতি অধিক বয়সেও হত না। কাজেই পূর্ণ যৌবনা রমণীর সন্তান ধারণের সুস্থতা অনেক বেশি থাকত বলেই সকাল গড়িয়ে দুপুর পর্যন্ত গর্ভাধানের ব্রত-নিয়ম পালন করেই রাত্রিকালে সহবাসের মন্ত্র পড়তেন স্বামীরা।

সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র গর্ভাধান-সংস্কারের অন্তরে চতুর্থী কর্ম বলে একটি স্মার্তক্রিয়ার উল্লেখ করেছে। সেটা আসলে বিবাহের তিনদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত কর্ম। গর্ভাধানের হোম-যজ্ঞের পর চতুর্থী কর্ম অন্য কোনো স্মার্ত কর্ম সূচিত করে না। বরং বলা উচিত, দিবসের স্মার্তক্রিয়ার পর এ হল নিশীথরাতের শারীরিক অবসর। রজোদর্শনের ঘটনাটা এখানে স্বতঃসিদ্ধ।

পরবর্তী সময়ে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স কম হয়ে যাওয়ায় চতুর্থী কর্মের আচারও উঠে যায়। থেকে যায় শুধুই গর্ভাধান। অন্যেরা চতুর্থী কর্ম শব্দটা বাদ দিয়ে বলেছেন নিষেক কর্ম। এতে যেসব মন্ত্র উচ্চারণ করে রমণীর যেসব অঙ্গ স্পর্শ করার বিধি আছে, তাতে উচ্চতর গভীর ভাবনা তো কিছু নেইই, বরঞ্চ মন্ত্রবর্ণের শব্দ যে-সব অর্থ প্রকাশ করে, তাতে স্ত্রী-পুরুষের মিলন আরও গাঢ়তর হয়। কিন্তু এর মধ্যেও যেটা খুব লক্ষ করার মতো, তা হল মন্ত্রোচ্চারণ বা যৌনমিলনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৈদ্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপও আছে। দূর্বা বা অশ্বগন্ধার পিষ্টরস স্ত্রীর নাকে নস্যি দেবার মতো করে দিয়ে নিয়ে তারপর মন্ত্র-তন্ত্র ও সহবাস বিধি।

গর্ভাধানের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটি হল–যেমন এই পৃথিবীর গর্ভে অগ্নি আছে, যেমন আকাশের গর্ভে আছেন ইন্দ্র, দিক্‌সমূহের গর্ভে যেমন আছে বায়ু সেই রকম আমি তোমার গর্ভাধান করলাম। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের কেউ কেউ বলেন প্রথম সন্তানলাভের আগে একবারই মাত্র এই গর্ভাধানের ক্রিয়াকাণ্ড আচরণীয়। অন্যেরা বলেছেন–না, প্রত্যেক সন্তানলাভের পূর্বেই গর্ভাধানের স্মার্ত ক্রিয়া বিধেয়। বলিহারি এই স্মার্তদের। এরা বুঝলেন না–নারী-পুরুষের সহবাসের অভিসন্ধিই যেখানে প্রধান, সেখানে এত ক্রিয়াকাণ্ড, হোমযজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণের জটিলতা থাকলে সে সংস্কার বেশিদিন টিকে থাকে না। টিকে থাকেওনি।

অবশ্য এই সংস্কার উঠে যাবার পিছনে স্মার্তক্রিয়ার জটিলতার চাইতে সামাজিক কারণই বেশি। পঞ্চনদীর জলধোয়া অঞ্চল পিছনে রেখে যে জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, সে জাতির প্রত্যেকটি পুরুষ নিজেদের বহুলভাবে প্রসারিত করার জন্যই এক একজনে দেবতার কাছে দশটি করে পুত্র চেয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এই প্রসারণ কর্ম অনেকটাই পূর্ণ হয়ে ওঠে, সরস্বতী-দৃষদ্বতীর অন্তর দেশ ছাড়িয়ে উত্তরে, দক্ষিণের এবং পূর্বেও যখন আর্যদের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আর দশ-দশটা পুত্র সন্তানের জন্য আর্য পিতাকে কেঁদে মরতে হয়নি। গর্ভাধান-কর্মের স্মার্ত সংস্কারও তাই সমাজ থেকে লুপ্ত হল। যা পড়ে রইল, তা একেবারেই আদিম সংস্কার, অনাদি অনন্ত সহবাসবিধি।

জনমত

নতুন এক কলম্বাস, যাঁকে ভারত ভোলেনি

নতুন একজন কলম্বাস যিনি প্রথম পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ভারতবর্ষের সঠিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের আলোড়নকারী শিকাগো বক্তৃতার একশো পঁচিশতম বর্ষ শুরু হল। পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা আমেরিকার শিকাগো শহরে এই প্রথম পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌজন্য এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এক অভিন্ন ভিত্তিভূমিতে মিলিত হয়েছিলেন। স্বামীজি নিজেই এই আয়োজনকে স্বীকৃতি জানিয়ে একে মহামতি অশোক এবং আকবরের সভার সঙ্গে তুলনা করে এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সুকঠোর চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে পরাধীন ভারত থেকে নিঃসম্বল অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে তিনি জীবনের জয়গান গেয়ে আমেরিকাবাসীর মন জয় করেছিলেন। তাঁর সেই বলা কথাগুলো আজও খুবই প্রাসঙ্গিক। সেই সভায় উপস্থিত এনি বেসান্তের প্রতিক্রিয়া–'সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়...ভারতের বাণীকে তিনি বহন করে এনেছেন।' বক্তৃতায়, বাগ্মিতায় স্বামীজি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো সপ্তাহে সতেরোটি বক্তৃতা, কখনো আড়াই ঘণ্টাব্যাপী টানা ভাষণ। তাঁর সুমহিম বিরাট ছবি, বাগ্মিতার সংবাদে ভরে থাকত পাশ্চাত্যের সংবাদপত্র। তাঁর বাগ্মিতায় পাশ্চাত্য আবিষ্কার করল ভারতকে। কিন্তু স্বামীজি কেন এই ধর্ম মহাসভায় যেতে রাজি হয়েছিলেন তাঁর কারণ নিহিত রয়েছে পরিব্রাজক জীবনে দেখা ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অভিশাপের মধ্যে, রয়েছে শোষণ আর নির্মম অবিচারের মধ্যে। স্বামীজির কথায়–'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ওই গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনো চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক !...একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ...আমেরিকায় এসেছি নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব। দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল।' এই দারিদ্র্যমুক্তির উপায় অন্বেষণ এবং ভারতের কল্যাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ ছিল তাঁর আমেরিকা গমনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পাশ্চাত্যে গিয়ে স্বামীজি দেখলেন–'দারিদ্র্যের যে নগ্ন রূপের জন্য আমরা জগতের কাছে অবহেলিত সেই ভারতের চেয়ে এই পাশ্চাত্য দেশ, আর একদিক দিয়ে দরিদ্রতর। তাদের অভাব নৈতিকতার, আধ্যাত্মিকতার।' স্বামীজির আমেরিকার চারদিকে বক্তৃতা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের জাগতিক উন্নতির সঙ্গে প্রাচ্যের আধাত্মিকতার মেলবন্ধন ঘটানো। আরও একটি লাভ হল, পাশ্চাত্যবাসীর ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখে, স্বামীজির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার ভাব দেখে নিদ্রিত জাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। ভারত ও ভারতীয়দের উন্নতিকল্পে খেটে খেটে আয়ুক্ষয় করে যাওয়া বিরল সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন পরম আশ্চর্যের ! ভারতীয় জাতিয়তাবোধকে এই নবীন সন্ন্যাসীই জাগ্রত করেছিলেন।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

২.

আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, চেতনা ও আদর্শের মেলবন্ধন চাই। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো মহাসম্মেলনে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-গর্ব ও হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতিকে বিশ্ববাসীর কাছে পূজনীয় করে তুলেছিলেন স্বামীজি। তাঁর আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সমগ্র বিশ্ববাসী সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজি ছিলেন ভারতমাতার পূজারি। ভারতবর্ষকে অগাধ ভালোবেসে এবং তাকে আরাধ্য করে উপাসনা করতে পেরেছেন তিনিই। তাই তাঁকে সবাই আপনজন মনে করেন। তাঁর লেখা পড়েই দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্ম নেয় গান্ধিজি, নেতাজি সুভাষ ও অন্য বীর বিপ্লবী সন্তানদের মনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু পুজো করলেই চলবে না, তাঁর আদর্শ, বাণী আমাদের সমাজ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঘটলেই আরও বেশি করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

প্রণব সূত্রধর
আনন্দনগর, আলিপুরদুয়ার।

৩.

শুভ এবং অশুভ মিলিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখটির একটি আলাদা ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা তাৎপর্য রয়েছে। এখন থেকে ১২৫ বছর আগে (১৮৯৩ সালে) আমেরিকার শিকাগো শহরের ঐতিহ্যশালী কলম্বাস হলে বসেছিল বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের আসর, চলেছিল ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেই আসরে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ ১১ সেপ্টেম্বর বিকালে দীপ্ত কণ্ঠে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, তা শুনে হল ভরতি দর্শকদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিন্তাধারাই বদলে গিয়েছিল। তখন থেকে ভারতবর্ষ বা ইন্ডিয়া একটা আলাদা গৌরবজনক পরিচিতি লাভ করেছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আবার ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী হামলায় আমেরিকার গর্বের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ভেঙে পড়েছিল, অগণিত মানুষের অকালপ্রয়াণ ঘটেছিল। বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী জনগণ কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ধ্বংসাত্মক, রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসবাদী হামলাকে আজও যথেষ্ট ঘৃণা করে এবং আগামীদিনেও করবে। পাশাপাশি ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গর্বের সঙ্গে স্মরণে রাখবে।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

শিলিগুড়ি ডাকঘরের নৈরাশ্যজনক কাজ

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়া ডাকঘরে আমার একটি SCSS A/c No. 8741083621 dt. 05/08.10.15, CIF Id 78772 1115 আছে, যেটি বর্তমানে শিলিগুড়ি HPO SB A/c No. 32124 89489 CIF Id 309076792-এর সঙ্গে সংযুক্ত। অকারণে ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের জন্য আমার SCSS-এর ত্রৈমাসিক সুদ থেকে গতবছর ২৩ এপ্রিল ৭৮৪০.০০ টাকা আয়কর বাবদ কেটে নেওয়া হয়। আমি আয়করের আওতায় না পড়ায় টাকাটা আমার HPO SB A/c-এ জমা দেওয়ার জন্য দেশবন্ধুপাড়া ডাকঘরে আবেদন করি। কিন্তু আজ আবধি টাকা জমা পড়েনি এবং ইনটারনেটে খোঁজ করে দেখা গেছে সেই টাকা আয়কর বিভাগে আমার PAN No. ADVPN 1075C-তেও জমা পড়েনি। তাহলে টাকাটা গেল কোথায় ? বাধ্য হয়ে আমি গত ২৩ জুলাই পিএমজি নর্থবেঙ্গল রিজিয়ন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস, দার্জিলিং ডিভিশনকে সব জানিয়ে ই-মেল করি ও তার প্রতিলিপি ডাকে পাঠাই। ডাকবিভাগ থেকে কি সদুত্তর পাব ?

স্মৃতিকণা রায়
উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি।

ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ

ভীমনারায়ণ মিত্রের লেখা পত্র 'দেবীর পবিত্র মন্দির কিন্তু কসাইখানা নয়' পড়লাম। আমাদের ভারতে সংবিধান অনুসারে কেউ কারো ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। খাদ্যের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন প্রাণীহত্যা করা হয়। এছাড়াও বলিদান, কুরবানি প্রভৃতি নিয়মের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা প্রাণী নিধন করেন। ভীমনারায়ণবাবু কি প্রত্যেককে প্রাণীহত্যা না করতে বলেছেন ? প্রাণীহত্যা না করলে তো সবাইকেই নিরামিশভোজী হতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত মন্দিরে তিনি বলিদান না করতে পারেন। কিন্তু অন্যের ধর্মাচরণ পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ কেন ?

রতন দাস
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

মশা মারুন

বর্তমান সময়ে শিলিগুড়িতে ডেঙ্গু আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বহু মানুষ ডেঙ্গুতে ভুগছে। শিলিগুড়ি পুরসভার কাছে তাই আমার অনুরোধ, ড্রেন ছাড়াও মানুষের বাড়িতেও মশা মারার উদ্যোগ নেওয়া হোক।

রণজিৎ দাস
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

বন্যার শিক্ষা : আমাদের দরকার নদী পরিকল্পনা

এবছর বন্যার জেরে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ধান ও সবজি নষ্ট হয়েছে। বহু মানুষের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে। নিরন্ন, গৃহহীন মানুষ রাস্তার উপর, বিদ্যালয় গৃহে আশ্রয়ে আছেন। সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ত্রাণ সরবরাহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও গৃহহারা, স্বজনহারা নিরন্ন মানুষের অনেক ক্ষোভ ও দুঃখ আছে। বন্যার প্রকৃত কারণ কয়েকদিনের অস্বাভাবিক বৃষ্টি সহ বিহার ও নেপাল থেকে প্রবাহিত নদীগুলির জলের চাপ। তাতে মনে হয় এবছরের বন্যা গত ১৯৮৭ ও ২০০০ সালের বন্যা থেকেও ভয়ংকর। এখানে লক্ষণীয়, বৃষ্টির জলের প্রবাহ খাল-বিল ও ছোটো নদীর মাধ্যমে বড়ো নদীতে পড়ে, বড়ো নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে নেমে যায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নদী ও খাল-বিলের জল বহনের ক্ষমতা নেই। বেশিরভাগ নদী পলি ও বর্জ্য জমে মজে গেছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতে দুই কূল ছাপিয়ে বন্যা হয়েছে। এর জন্য চাই নদী পরিকল্পনা। নদী খনন করতে হবে। শক্ত মাটি দিয়ে নদীর পাড় বাঁধিয়ে দিয়ে তাতে গাছ লাগানো গেলে ভালো। নদীর বাঁধগুলির সংস্কার ও মেরামত দরকার। এছাড়া এই বন্যার জল প্রবাহ দেখে স্থনীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ার, সেচ বিভাগ সকলের একটি সমীক্ষা ও পরিকল্পনা রাখার দরকার যে জলের প্রবাহের ঢাল কোন দিকে। যে সব বাঁধ বা রাস্তায় কালভার্ট ক্ষুদ্র স্বার্থে বন্ধ করা হয়েছে সেখানে কালভার্ট বানানো দরকার। যে সব সেতু পুরোনো হয়েছে সেগুলি মেরামত করা দরকার। এই জন্য চাই অর্থ বরাদ্দ, তদারকি ও আন্তরিক প্রচেষ্টা।

জীবনকুমার মুন্সী
স্কুলপাড়া, কালিয়াগঞ্জ।